# প্রজন্ম

## তপন দেবনাথ

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজের বইএর টেবিলে একটি চিঠি দেখতে পেলো সোহান। পিয়ন কখন চিঠিখানা দিয়ে গেছে তা সে জানে না। এখনো খামের মুখ খোলা হয়নি। চিঠিখানা এসেছে সোহানের মায়ের নামে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পক্ষ থেকে।

হাতে নিয়ে খামের মুখ না খুলে চিঠি খানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো সোহান। মাকে ডাক দিল সে।

'মা তোমার নামে চিঠি এসেছে। দেখেছো তুমি ?'

রান্না ঘর থেকে জবাব দিলেন সোনাবানু। 'এ রকম তো প্রতি বছরই আসে। ও দিয়ে আমার

কোন কাজ নেই। তোর জন্য ভাত বেড়েছি।

খাবি আয়।'

'চিঠি খুলে পড়বো ?'

'তোর দরকার থাকলে পড়। আমার কোন দরকার নেই।'

দুপুর বেলা পিয়ন যখন চিঠিখানা দিয়ে গেল তখনই সোনাবানু তাচ্ছিল্যের সাথে তা ছেলের টেবিলে রেখে দিয়ে ছিলেন। ছেলে স্কুল থাকে বাড়ি ফেরার পর তা তিনি ছেলেকে দেয়ার কোন গরজ অনুভব করেননি। এ রকম চিঠির প্রতি বরাবরাই তার একটি অনীহা হচ্ছিল।

চিঠির মুখ খুললো সোহান।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাঠিয়েছে। এবারো সোনাবানুকে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ আতিথি হিসেবে নিমন্ত্রন জানানো হয়েছে। যদিও সোনাবানু প্রতিবারই এ ধরণের চিঠিকে আমলে নিচ্ছেন না।

'এবারো তোমাকে বিশষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রন জানিয়েছে মা। প্রতিবারই তো যাও না। এবার চলো যাই।'

'তোর দরকার হলে যা। আমার কোন দরকার নেই। ভাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খাবি আয়।'

উঠানের পাশে স্বল্প গভিরতায় টিউবওয়েলের জলে হাত-মুখ ধূয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সোহান রান্না ঘরের দিকে গেল।

পিঁড়িতে আসন করে বসে খেতে আরম্ভ করলো সে।

'এবারো তাহলে তুমি যাবে না মা ? তাহলে বার বার তোমাকে চিঠি লিখে তাদের লাভ কি ?'

'কে তাদেরকে বলে আমার কাছে চিঠি লিখতে ? আমি কে তাদেরকে বলেছি কোনদিন ?'

'লিখে তো তুমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বলে। তোমাকে সম্মান জানাতে চায়, আর তুমি কিনা....।'

সোনাবানু নির্লিপ্ত। ছেলের মুখে এমন কথা এর আগেও সে বহুবার শুনেছে। স্বাধীনতার প ক্ষে অনেক কথা শুনেছে সে। ছেলে যদি তখন বড় থাকতো তাহলে সে-ও বাবার সাথে যুদ্ধে যেত। মরতে হলে বাপবেটা একত্রে মরতো। সে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। স্বাধীনতা বাংলাদেশের হাজার বছরের অর্জন।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান । এমন হাজারো কথা সে ছেলের মুখে শুনেছেন । এ চিঠি আসার পর যে সোহান মাকে এমন পুর নো দু'চারটি কথা আবার শোনাবে এ ব্যাপারে তিনি অনেকটা নিশ্চিতই ছিলেন ।

'তোকে কি আর এক চামচ ভাত দিবো ?'

চামচ হাতে সোনাবানু ভাতের পাতিলের কাছে গেলেন ।

মুখ থেকে মাছের কাটা মাটিতে ফেলে সোহান মাথা তুলে মায়ের দিকে তাকাল ।

খলসে মাছের সাথে মুলা তরকারি । সাথে ধনে পাতা । রসুন দিয়ে লাল শাক ।

'তরকারিটা দারুন হয়েছে মা । ধনে পাতা পেলে কোথায় ?'

'বকুলের মার থেকে ধার এনেছি । দেখিস তো আজকে হাটে ধনে পাতা পাওয়া যায় কিনা । মাছ দিবো আর একটা ?'

'দিবে ? দাও । বিকেলে হবো তো ?'

'কেন, আজকে হাটবার না ? হাটে যাবি না ? ঘরে অনেক সওদা লাগবে ।'

'আজকে যে হাটবার সে কথা আমার মনেই নেই ।'

মুখে ভাত দিয়ে সোহান আবার মায়ের দিকে তাকালো ।

সোনাবানু ছেলের মুখের দিকে সন্দেহের দৃস্টিতে তাকালেন । মৃদু হাসেলেন তিনি ।

'কিছু বলবি ?'
'কী আর বলবো ? তুমি তো আমার কোন কথাই রাখ না ।'

'কোন কথাটা রাখিনি তোর ? তুই ছাড়া আমার আছে কে ?'

'কেউ নেই সেটা ঠিক । আমি বলি কি মা, সমাজে চলতে গেলে তো অন্যদের মতামতের গুরুত্ব দিতে হয়, তাই না ? তাছাড়া স্কুলে শিক্ষকতা করি,, এখন আমাকে দু'চারজন লোক তো চেনে । কী বলো, চিনে না ?'

'এটা তোর আসল কথা নয় । আসল কথাটা কি বল ।'

'আমি কি বলতে চাই তা তুমি বুঝতে পেরেছো ।'

'ঐ অনুষ্ঠানে গিয়ে একটা চেয়ার জুড়ে বসে থাকা, আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, এই তো তোর কথা ?'

'ঐভাবে বলো না মা । ওনারা তোমাকে সম্মান করছেন । তোমার সেটার মর্যাদা রক্ষা করা উচিত । '

বিড়ালটা সোহানের সামনে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যাও ম্যাও করে দু'টো ডাক দিল । সোহান তাকে কিছু ভাত ও মাছের কাটা দিলো ।

'শুক্রবারে গিয়ে বউ ও নাতনীকে নিয়ে আসবি । কয়েকদিন তো হয়ে গেল । ঘরটা খালি খালি লাগে ওরা না থাকাতে ।'

'সে যাব । তুমি এবার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠা-নে যাচ্ছো তো ?'

'আমাকে নিয়ে টানাটানি করিস না সোহান । তুই যা । তুই গেলেও যে কথা আমি গেলেও সে কথা ।'

'আমি তো যাবই মা । আমাকে তো আর বিশেষ অথিতি করে ডাকেনি । আমার স্কুলে যখন অনুষ্ঠান হবে আমাকে তো যেতেই হবে । তুমি গেলে আমার খুব ভালো লাগবে ।'

'কী হবে আর এসব অনুষ্ঠান করে ? মানুষটা তো আর ফিরে আসবে না ।'

মাথা তুলে সোহান মায়ের মুখের দিকে তাকালো । সোনাবানু অশ্রুসিক্ত । বাবার কথা উঠলেই মা কেমন যেন মনমরা হয়ে যায় । সোহান তা বুঝতে পারে । তখন সে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথা বলে । মুখ ঘুরিয়ে নেয় সোনাবানু । মায়ের মনে যে শান্তনা দিতে পারেনি সোহানও সেটা বোঝে । কথা সমাপ্ত হয় কোন শান্তনা ছাড়াই ।

ভাত খাওয়া শেষ করে টিউবওয়েলে মুখ ধূয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছে চৌকিতে বসে সোহান । চিঠিখানা আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সে । কী কথা বলে যে মায়ের মন গলাবে বুঝতে পারে না সোহান । নানা কৌশল খুঁজে সে । সোনাবানু যেন ছেলেকে কিছু একটা বলতে চান বলে মনে হয় । রান্না ঘর থেকে তিনি বারান্দায় এলেন ।

সুচতুর দৃস্টিতে সোহান মায়ের মুখের দিকে তাকালো । কোন একটা কথার সূত্র খুঁজছে সে ।

'জানো তো মা বছর শেষে এবার বেতনটা আমার ভালোই বাড়বে । তুমি যা ভাতা পাও তা দিয়ে আমাদের ভালোই চলবে । চিন্তা করছি আর একটা ডিপিএস খুলবো ।'

মুখ খুললেন সোনাবানু । 'ভাতা না ছাই । যে টাকা ভাতা দেয় তা দিয়ে একজনের চলে না, একটা পরিবার তো দূরের কথা । আমার স্বামী কে এনে দিক, ওদের ভাতা আমার দরকার নেই ।'

প্রসঙ্গ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে আঁচ করতে পেরে সোহান পরিস্থিতি মায়ের দিকে রাখতে চেস্টা করছে ।

'মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটা আছে বলে আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে চাকরিটা পেয়েছি মা । তা না হলে আমার চাকরিটা হতোনা।'
'তোর কথায় কেমন যেন স্বার্থপরের গন্ধ পাই সোহান । যাদের বাবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নয় তারা কি দেশে চাকরি পাচ্ছে না ?'

'পাচ্ছে । তুমি যে মাঝে মাঝে বলো স্বাধীনতা আমাদের জন্য কোন মুক্তিই আনতে পারেনি তাই বললাম যে স্বাধীনতার অর্জন একেবারে

কম নয় ।’

‘তুই মাস্টার হয়েছিস । তাই হয়তো আমাকেও তোর ছাত্রী মনে করছিস । তোর বাবা যখন যুদ্ধে যায় তোর তো তখন জম্মই হয়নি । তুই তখন সাতমাসের । আমি আমার বাবার বাড়ি চলে যাই । ক’দিন পরেই খবর পাই যে ফরিদ গাজীর লোকেরা আমাদের ঘরটা পুড়িয়ে দিয়েছে । ঘরটা যুদ্ধ বিরোধীদের কী ক্ষতি করেছিল ? আমি যে এসে দেখবো আমার শরীরের তখন সে অবস্থা ছিল না । আমি যদি তখন আমার বাবার বাড়িতে না থাকতাম তাহলে তারা হয়তো আমাকে সহই ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতো । তার ঠিক দু’মাস পরে তোর বাবার মৃত্যু সংবাদ আসে । লাশ যখন বাড়িতে এনে রাখে তখন কয়েক ঘন্টার জন্য আমি বাড়িতে যাই আব্বার সাথে । গিয়ে দেখি উঠানে স্বামীর লাশ । স্বাধীনতা যুদ্ধে সে শহীদ হয়েছে । ভিটাতে ঘরটা নেই । ফরিদ গাজীর লোকের বাঁধা দিচ্ছে তোর বাপের জানাজা পড়া যাবে না কারণ সে পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছিল । যদিও তার সে চেস্টা সফল হয়নি । এর একমাস পরে তোর জম্ম । জীবনের উঠতি বয়সেই আমি স্বামীহারা,সহায় সম্বলহীন, গৃহহীন হয়ে বাবার বাড়ি আশ্রয় নেই । আমার বাবা-ভাইয়েরা আমাকে আশ্রয় না দিলে আমর যে কী হতো ?’ কেঁদে দিলেন সোনাবানু ।

‘তোমার দু:খ কি আমি বুঝি না মা ? তুমি স্বামীহারা, আমি পিতৃহারা । আমার পিতা আমার মুখ না দেখে মারা গেলেন । আমি আমার পিতার মুখ কোনদিন দেখতে পেলাম না । এরচেয়ে দূর্ভাগ্য আর কি আছে ? আমার পিতার মুখ একবারের জন্যেও দেখতে পাইনি কিন্তু প্রতিদিন তো স্বাধীন বাংলাদেশের মুখ দেখতে পাই । বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে আমি দেখতে পাই আমার বাবার হাসি মুখ ।’

অবাক বিস্ময়ে সোনাবানু ছেলের মুখের দিকে তাকালেন । ছেলের মুখে এমন কথা তিনি আশা করতে পারেন নি ।

‘সত্যি বলছিস সোহান ? স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে তুই তোর শহীদ পিতার মুখ দেখতে পাস ?’

‘সত্যি বলছি মা । আমার যে গর্ব গর্ব ভাবটা দেখ সেটা আমার বাবার জন্যই । মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই একদিন মরে যায় । আজকে যে স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে আছো সেটা আমার আব্বার প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে । নিজের জীবন উৎসর্গ করে কিছু অর্জন করে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে মহত্বর আর কি হতে পার ? নিজের জীবন ত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ আর কী আছে ?’

অশ্রুসজল নয়নে সোনাবানু ছেলের দিকে তাকালেন । ছেলে শুধু মাস্টারই হয়নি, কথাও শিখেছে ।

কান্নাকাটি সোনাবানুর নতুন কোন ঘটনা নয় । মায়ের মুখের দিকে তাকালো সোহান । তিনি যেন ছেলের মুখে আরো কিছু শুনতে চান ।

‘কবে যেন অনুষ্ঠান বললি ?’

সন্দেহের দৃস্টিতে সোহান মায়ের দিকে তাকালা । তিনি অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবেন এটা যেন তার কাছে অপ্রত্যাশিত ।

‘এই তো ষোল তারিখে । তুমি যাবে মা ?’

চোখ তুলে সোনাবানু ছেলের চোখে তাকালেন । মুখে কোন কথা বললেন না । তিনি হ্যাঁ বললেন নাকি না বললেন সোহান বুঝতে পারলো না ।

‘তুমি মনে করেছো স্বাধীনতা বুঝি অর্থহীন হয় পড়েছে, তা মোটেও নয় মা । এতদিনে যা অর্জন হবার কথা ছিল তা হয়তো হয়নি কিন্তু ধীরে ধীরে তা অর্জিত হচ্ছে । নতুন প্রজম্মের মাঝে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস কত বেশী তা তুমি গেলেই দেখতে পাবে । আমার আব্বার স্বপ্ন লালিত হবে আমার মাঝে, আমার স্বপ্ন লালিত হবে আমার সন্তানের মাঝে । স্বাধীনতাই লালিত হতে থাকবে প্রজম্ম থেকে প্রজম্মে মা, আর বিরোধীরা ধীকৃত হতে থাকবে বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ।’

‘তুই এত কথা কবে শিখলিরে সোহান ? তোর বাবা তো এত কথা বলতো না ।’

‘বাবার কথা আর বলো না মা । অকালে চলে গেল । তখন যদি আমি থাকতাম, বাবার সাথে একত্রে যুদ্ধে যেতাম । মরতে হলে বাপ-বেটা একত্রে মরতাম ।’

মৃদু হাসলেন সোনাবাবু । ছেলে তার মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকে বটে ।

‘তোর তো তখন জম্মই হয়নি । যুদ্ধে যেতি কী করে ?’

‘সেটাই তো আমার দুঃখ । যুদ্ধে যেতে পারিনি বলে তো থেমে নেই । আমাদের অনেক কর্তব্য আছে মা । বাবার ঋন শোধ করতে পারবো না সত্য কিন্তু স্বীকার তো করতে পারবো । মাথার উপর হাত তোলো মা । আমার বাবার জন্য লাল সালাম ।’

মাথার উপর হাত তুলে সোহান আবোধ শিশুর মতো হাউমাউ করে কেঁদে দিলো । সোনাবানু দাঁড়িয়ে মাথার উপর হাত তুললেন । ছেলের কান্ড কারকাখা দেখে কি যে বলবেন বুঝতে পারছেন না ।

‘ঠিক আছে আমি যাবো সোহান ।’

‘যেতে তোমাকে হবেই মা । স্বাধীনতার কথা, বিজয়ের কথা তুমি ভুলে থাকো কী করে ? আজ আমার আর একটি বিজয় । ব্যাগ দাও । হাটে যাই । সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ।’ সোহান দু’হাতে চোখ মুছলো ।

সোনাবানু বাজারের ব্যাগ আনার জন্য ভিতরে গেলেন ।

---

লস এঞ্জেলেস
১২/২৩/২০০৮